Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 63 - 74
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 63 - 74
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের পদাবলীতে হর-গৌরী সম্পর্কের রূপায়ণ : তন্ত্রতত্ত্ব থেকে বাঙালির অন্দরমহল

ড. অদ্রিজা চৌধুরী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বারাসাত সরকারি মহাবিদ্যালয়
Email ID : chaudhuriadrija@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Ramprasad Sen, Kamalakanta Bhattacharya, Shakta Padaboli, Shiva, Uma, Tantra, Bhakter Akuti, Agomoni, Bijaya.

Abstract

Shakta Podaboli is a very important genre in the Medieval Bengali Literature. In the crucial time of 18th century Bengali poets started to write these poems where they tried to get a mental peace and shelter to 'Maa Kali' for expressing their grievances and grief. Ramprasad Sen and Kamalakanta Bhattacharya are the most prominent poets in this genre. Ramprasad is a true devotee of Kali. So He manifests His veneration in the Parjay of 'Bhakter Akuti'. In these poems He allegorically expresses the true meaning of Tantric 'Shiva-Shakti' theory. He reveals Tantric 'Shatchakrabhed' and 'Kundalini' theory through the metaphors of so called 'Shiva-Gouri's conjugal life. In this article we tried to decode that Metaphors through some tantric texts and references. Another poet Kamalakanta Bhattacharya is excellent in the Parjay of 'Agomoni' and 'Bijaya'. 'Agomoni' and 'Bijaya' is basically based on Uma's arrival in his father Himalaya's home and departure to Kailasa. In this context, Shiva has been portrayed as a poor, old and bohemian husband of Bengali girls of that period. Uma's mother Menaka's anguish and tormentation is revealed here thinking of Uma's miserable married life. Menaka sends Himalaya forcefully to Kailasa to fetch Uma only for four days and after four days when Shiva comes to take Uma mother Menaka's heart fills with distress and disappointments. Kamalakanta's poems reveal a common photography of contemporary Bengali Family through the cruel system of child marriage of many Uma. We tried to denote that problem through the married life of Shiva and Uma. Mother Menaka's cry and anguishes echoes through the poems and shows us the painful married life of sacrificed one common Bengali girl whose name is Uma. She is assimilated here with mythological Shiva's wife Uma. We analysed about it in the article.

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 63 - 74
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

অষ্টাদশ শতাব্দী বাঙালি জীবনের এক ভয়াবহ ক্রান্তিকাল। বারবার রাজনৈতিক পালাবদল, রাজস্বের জন্য সাধারণ মানুষের উপর মধ্যসত্ত্বভোগীদের অত্যাচার, জমিদারদের শোষণ বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থাকে তলানিতে দাঁড় করিয়েছিল। এর উপর ভয়াবহ আঘাত হয়ে এসেছিল বারবার বর্গী আক্রমণ, বর্গী অত্যাচার। এছাড়াও ইংরেজ বণিকদের আগমন, পর্তুগিজ দস্যুদের আক্রমণ, মোগল যুগ থেকে ক্ষমতার হস্তান্তরে ভূমিব্যবস্থার ব্যাপক ভাঙন বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করেছিল। যার আশু পরিণাম ছিল ছিয়াত্তরের বীভৎস মন্বন্তর (১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ/ ১১৭৬ বঙ্গাব্দ)। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে বাঙালির সামনে ছিল শুধুই অন্ধকার। তখন প্রয়োজন ছিল এমন এক শক্তির যে তাদের স্নেহের আশ্রয় দেবে, যার কাছে দাঁড়িয়ে জীবনের সব অভাব-অভিযোগের কথা বলে মানুষ পাবে দু'দণ্ড শান্তি। অন্যদিকে মধ্যযুগের দেবতাদের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ছিল মূলত ভয়ের কারণ তাঁরা স্বভাবত উগ্র। ছলে-বলে-কৌশলে মানুষের কাছে পুজো আদায় করাই তাঁদের লক্ষ্য। তাই ভয় থেকেই মানুষ তাঁদের পূজা করেছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের ভয়ংকর সময়ে দাঁড়িয়ে এমন দেবতাদের কাছে মানুষ শান্তির আশ্রয় পাচ্ছিল না। দেবতাদের এই ভয় সৃষ্টিকারী ইমেজ তাদের মানসিক আশ্রয়টুকু দিতে সমর্থ ছিল না। তাই জন্ম নিল শাক্ত পদাবলী। বাঙালি মাত্রেই মাতৃভক্ত। তাই উগ্রস্বভাব দেবদেবীর পরিবর্তে রামপ্রসাদ স্নেহকাতর আর্তিতে জগজ্জননী দেবী কালিকার স্মরণ নিলেন কারণ তিনি বিশ্বাস করেন মাতৃক্রোড়ে স্থান পেলে কোনো দুঃখই কিছু করতে পারেনা। কবি তাই বলেন—

> "আমি কি দুখেরে ডরাই?
> দুখে দুখে জন্ম গেল আর কত দুখ দেও দেখি তাই।।"[১]

তাই শাক্ত পদাবলী আসলে ভয়ানক সামাজিক অবস্থা থেকে মানুষের মুক্তির পথনির্দেশ। শাক্ত পদাবলীর মূলত তিনটি পর্যায়। 'ভক্তের আকুতি', 'আগমনী' ও 'বিজয়া'। 'ভক্তের আকুতি' পর্যায়ের পদগুলিতে দেবীর প্রতি কবির ভক্তহৃদয়ের আর্তি পরিস্ফুট। আর তাঁর মধ্যেই উঠে এসেছে তন্ত্রচেতনাজাত 'শিব-শক্তি' তত্ত্বের গভীরতা। আর 'আগমনী' মূলত উমার ঘরে ফেরার প্রতীক্ষায় মেনকার মাতৃহৃদয়ের উৎসারিত আবেগ। 'বিজয়া' উমার বিদায়ে মেনকার মাতৃহৃদয়ের হাহাকার। আগমনী ও বিজয়ার পদগুলিতে তাই শিব-উমার সাংসারিক জীবনের ছবি স্পষ্ট। শাক্ত পদাবলীতে হর-গৌরীর সম্পর্কের বিশ্লেষণে তাই রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত ভট্টাচার্য এই দুই কবিকে বেছে নিয়েছি।

রামপ্রসাদ সেনের পদাবলী : তন্ত্রচেতনাজাত 'শিব-শক্তি তত্ত্বের' অনুসন্ধান :

রামপ্রসাদের প্রতিভার সবটুকুই কেন্দ্রীভূত 'ভক্তের আকুতি' পর্যায়ের পদে। এই পদগুলিতে ভক্ত কবির আবেগের উৎসার যেমন দেখা যায় তেমনি পদগুলির ভিতরে রয়েছে তন্ত্রসাধনার নিগূঢ় শিব-শক্তির তত্ত্ব। তন্ত্রসাধনায় দেহের মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ডের সন্ধান করেন সাধকেরা। ষট্চক্রভেদে সর্পাকৃতি কুণ্ডলিনীকে সুষুম্না বরাবর সহস্রারে পৌঁছে দেওয়াই সাধকের লক্ষ্য। সেখানেই ঘটে শিব-শক্তির মিলন। রামপ্রসাদের গানে এই তত্ত্বের আধারে শিব প্রসঙ্গ বারবার উঠে এসেছে। যেমন একটি পদে কবি বলছেন—

> "আজ্ঞাচক্র করি ভেদ ঘুচাও ভক্তের খেদ
> হংসীরূপে মিল হংস বরে
> চারি ছয় দশ বার ষোড়শ দ্বিদল আর
> দশ শতদল শিরোপরে।
> শ্রীনাথ বসতি তথা, শুনে প্রসাদের কথা
> যোগী ভাসে আনন্দ সাগরে।"[২]

কবি এখানে পরমশিব ও পরমাপ্রকৃতির তত্ত্বকে স্পষ্ট করলেন এই পদটিতে। সাধকের শরীরে যে শিব-শক্তির লীলাখেলা চলে সেখানে 'হং-সো' বা 'সো-হং' এই শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়ার মাধ্যমেই সংঘটিত হয়। তাই তন্ত্রমতে 'হংস' হলেন পরাশিব। 'হংসী' হলেন কুণ্ডলিনীরূপিণী শক্তি। এই হংস বা হংসী কিন্তু আমাদের ধারণার সাকার শিব বা কালী নন। হংস বা হংসী নির্গুণ ব্রহ্মরূপী যা অচিন্ত্যনীয় ও অবাঙ্মানসগোচর। জীবের প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস ক্রিয়ার সঙ্গে 'হং' এবং 'স' এই অক্ষর দু'টি

অভিব্যক্ত হয়। তাই প্রাণকে বলা হয় ‘হংস’। জীবাত্মা হংসরূপে অবস্থিত। কুণ্ডলিনীশক্তি এই হংসকে আশ্রয় করেই আপনাকে ব্যক্ত করে থাকেন। আমাদের শরীরের ভিতর সুষুম্না বরাবর থাকে সাতটি চক্র। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, হৃদয়, বিশুদ্ধি, আজ্ঞা ও সহস্রার। আর মূলাধারে সর্পাকৃতি কুণ্ডলিনীশক্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকে। এই প্রতিটি চক্র আবার নির্দিষ্ট দলবিশিষ্ট পদ্মরূপে কল্পিত হয় সাধকের চেতনায়। যথাক্রমে— চারদল, ছয়দল, দশদল, বারোদল, ষোড়শদল, দ্বিদল ও হাজারদল বিশিষ্ট সহস্রার। সাধনার মাধ্যমে কুণ্ডলিনীকে এই চক্রগুলি বরাবর সহস্রারে পৌঁছে দেওয়াই সাধকের লক্ষ্য কারণ সেখানেই সাধকের শরীরে ঘটে শিব-শক্তির মিলন। সহস্রারে পৌঁছানোর আগের পর্যায় হল আজ্ঞাচক্র। সেই আজ্ঞাচক্রভেদ করেই কবি এই হংসীরূপী পরমেশ্বরীর সঙ্গে হংসসরূপী পরাশিবের মিলনের কথা বললেন হাজারদলবিশিষ্ট সহস্রারে যেটি অবস্থান করে আমাদের মস্তিষ্কে। কবি সাধনার সেই গভীর তত্ত্বের কথাই উল্লেখ করলেন শিব-শক্তির মিলনের মধ্যে দিয়ে। ‘শ্রীনাথ’ বলতে কবি পরাশিবকে বুঝিয়েছেন যিনি অবস্থান করেন মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিত হাজার দলবিশিষ্ট সহস্রারে। কুণ্ডলিনীরূপিণী শক্তিও অবস্থান করেন শরীরের মধ্যেই মূলাধারচক্রের নীচে। সেই শক্তি ও শিবের মিলন ঘটে সহস্রার চক্রে। রামপ্রসাদের আর একটি পদেও এই শিব-শক্তিরূপ বর্ণিত হয়েছে—

> “এক খুঁটিতে ঘর রয়েছে। তিন রজ্জুতে বাঁধা আছে।
> সহস্র কমলে শ্রীনাথ অভয় দিয়ে বসে আছে।
> দ্বারে আছে শক্তি বাঁধা চৌকিদারী ভার লয়েছে।
> সে শক্তির জোরে চেতন করে। তাইতে প্রাণ নির্ভয়ে আছে
> মূলাধারে স্বাধিষ্ঠানে কণ্ঠমূলে ভুরু মাঝে
> এ চারিস্থানে চারি শিব, নবদ্বারে চৌকী আছে।”[৩]

এই পদেও কবি সাধকের শরীরে শিব-শক্তির মিলনতত্ত্বের কথাই বলেছেন রূপকার্থে। এখানে প্রকৃতপক্ষে রয়েছে সহস্রারে শিব-শক্তির মিলনের পূর্ব পর্যায়ের কথা। ‘এক খুঁটি’ হল আমাদের মেরুদণ্ড যার উপর সম্পূর্ণ শরীররূপী ঘরটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেটি তিন রজ্জুতে বাঁধা অর্থাৎ তিনটি নাড়ী— ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার কথা বলেছেন। ‘সহস্র কমল’ অর্থাৎ হাজারদলবিশিষ্ট সহস্রার চক্র। সেই সহস্রারচক্রে রয়েছেন ‘শ্রীনাথ’ তথা নির্গুণ পরাশিব। ‘দ্বার’ বলতে কবি বুঝিয়েছেন এই সুষুম্নার প্রবেশদ্বার তথা সাধকের সাধন শুরুর স্থান মূলাধার চক্রকে। সেইখানে রয়েছেন কুণ্ডলিনীরূপিণী শক্তি তথা পরমাপ্রকৃতি। সেই শক্তিই কাজ করে জীবের চেতনারূপে। কবি কল্পনায় মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, কণ্ঠমূল (বিশুদ্ধ চক্র) ও ভ্রূমধ্যে (আজ্ঞাচক্র) এই চারস্থানেই শিব আধাররূপে অবস্থান করেন আর সহস্রারে যিনি আছেন তিনি ‘শ্রীনাথ’ বা পরাশিব বা নির্গুণব্রহ্ম। আর শরীরের নবদ্বার বা ন’টি ছিদ্রকে (দুই চোখ, দুই কান, দুই নাসারন্ধ্র, মুখ, পায়ু ও উপস্থ) কবি রোধ করেছেন। এটিকে কুণ্ডলিনীস্থিত পরাশক্তি ও সহস্রারস্থিত পরাশিবের মিলনের প্রস্তুতিসূচক পদ বলা যেতে পারে কারণ সহস্রারের পরাশিবের দিকে কুণ্ডলিনীর যাত্রা এখানে শুরু হয়নি।

আর একটি পদে কবি শিব-শক্তির সম্বন্ধকে একটি অপূর্ব ব্যঞ্জনার মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন—

> “শিব নয় মা’র পদতলে,
> লোকে মিথ্যা কথা বলে।।
> মূল কথা মার্কণ্ড মুনি,
> চণ্ডীতে লিখেছে খুলে।।
> দৈত্য ব্যাটা ভূমে পড়ে,
> মা দাঁড়িয়ে তার উপরে।।
> মায়ের পদস্পর্শে দানবদেহ
> শিবরূপী হয় রণস্থলে।”[৪]

কালীর পদতলে আমরা শিবকে দেখতে পাই। বহুল প্রচলিত লোককথা অনুযায়ী যুদ্ধক্ষেত্রে রণোন্মাদিনী কালীকে শান্ত করার জন্য শিব মাটিতে শুয়ে পড়েন এবং পায়ের তলায় স্বামীকে দেখে কালী শান্ত হয়ে যান। পরমপুরুষ শিব ও পরমাপ্রকৃতি

কালী আসলে নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ যাঁদের রূপ অচিন্ত্যনীয় বলেই আমরা আমাদের সীমায় বাঁধার জন্য স্বামী-স্ত্রী রূপে কল্পনা করি। ফলত গড়ে ওঠে নানা কাহিনি। দেবী কালিকাই এই জগতের মূল। তিনি শবের দেহে পা স্পর্শ করেন বলে তাঁর স্পর্শে শবের দেহে শিবত্ব সঞ্চারিত হয়। তাই কবির মনে হয়েছে কালী যখন যুদ্ধে নামছেন তাঁর সামনে যারা আসছে দেবী তাদেরকেই সমূলে হত্যা করছেন। সেইরকম একটি শবে দেবী পা ছোঁয়ালে তার তৃতীয় নয়ন উন্মোচিত হয়ে শিবত্ব সঞ্চারিত হচ্ছে। তাই দেবীর পায়ের তলায় যেই শিব থাকেন তিনি অর্ধনিদ্রিত। মৃত অবস্থা থেকে সদ্য জাগ্রত। কবির কল্পনায় এই শিব আসলে একজন দৈত্য পরমাপ্রকৃতির স্পর্শে যিনি শিব হয়ে ওঠেন। দেবীকে তন্ত্রমতে একান্ন অক্ষরে জপ করা হয়। এই একান্ন অক্ষরের প্রতি বর্ণেই দেবীর স্থিতি। আর একান্ন অক্ষরই হল দেবীর শক্তিস্বরূপ। দেবীর গলায় সেইজন্য আমরা একান্ন মুণ্ডের মালা দেখতে পাই। মুণ্ডমালা বর্ণের প্রতীক। দেবীর একান্ন অক্ষরের একটি হল 'ই' যা প্রাণসূচক।[৫] কবির কল্পনায় তাই সেই 'ই' কার সঞ্চারিত হয়েই 'শব' হয়েছে শিব। আর একটি পদেও রামপ্রসাদ বলেছেন—

"ঐ যে প্রাণ দিয়ে শব হ'য়ে শিব (ও পদ) বাঁধা রাখিয়াছে।"[৬]

রামপ্রসাদ এই প্রসঙ্গে মার্কণ্ডেয় মুনি লিখিত 'শ্রীশ্রীচণ্ডী'র উল্লেখ করেছেন আসল কথা সেইখানে লিখিত হয়েছে বলে। এরমধ্যে একটি স্থানে দেবীই যে এই জগতের আধার তার উল্লেখ রয়েছে। আমাদের মনে হয় কবি সেই স্থানটিকেই বোঝাতে চেয়েছেন। চণ্ডীর দশম অধ্যায়ে দেবী শুম্ভকে বলেছেন—

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।" (১০। ৫)

অর্থাৎ দেবী বললেন—

"একমাত্র আমিই এই জগতে বিরাজিতা। মদ্ব্যতিরিক্ত আমার সহায়ভূতা অন্যা দ্বিতীয়া আর কে আছে?"[৭]

তারপর দেবী যেই আটজন মাতৃকাগণের সহায়তায় যুদ্ধ করছিলেন (ব্রহ্মাণী, কার্তিকেয়ী প্রমুখ) তাঁরা দেবীর ভিতরেই লীন হলেন। অর্থাৎ দেবী একাই স্বয়ংসম্পূর্ণা। তিনি নির্গুণ, পরমব্রহ্মময়ী। সেই পরমা প্রকৃতির কোনো স্বামী নেই। পরাশিবের সঙ্গে তিনি অবিচ্ছেদ্য। তাঁরা আসলে এক। তাই কবির মনে হয়েছে ঐ শিবরূপী শব আসলে যুদ্ধে হত কোনো দৈত্য। পরের পংক্তিতেই কবি তাই বলছেন—

"সতী হয়ে পতির বুকে,
কে পা দিয়েছে,
কোন সে লোকে।।"[৮]

এখানে সতী অর্থে সতী নারীকে বোঝানো হয়েছে, দাক্ষায়নী নয়। কালীকে আমরা শিবের সতী নারী বলেই জানি। তাই কবি মনে করিয়ে দিচ্ছেন সংস্কারবশে কোনো নারীই তার স্বামীর গায়ে পা দেয় না। পরমাপ্রকৃতি এমন এক সত্তা যিনি যাবতীয় লিঙ্গভেদের বাইরে, পুরুষ বা নারী সবই তিনি। কমলাকান্তের একটি গানেও আছে—

"জানো নারে মন পরম কারণ কালী কেবল মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ কখনো কখনো পুরুষ হয়।"[৯]

রামপ্রসাদও মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে এই পরমাপ্রকৃতি মহাকালী কোনো সাধারণ সতী নারী নয় যিনি স্বামীর বুকে পা দেওয়ার লজ্জায় শান্ত হয়ে জিভ বের করবেন। আসলে কবি বলতে চেয়েছেন শিব মায়ের স্বামী নন, সে কেবল আমাদের চেতনায়। পরাশিব মায়ের পদতলে থাকতেই পারেন না। তাঁরা অবিচ্ছেদ্যভাবে সাধকের সহস্রারে থাকেন মিলিত অবস্থায়। তাঁরা এক ও অভেদ। তন্ত্রমতে শিবশক্তি পরস্পর অবিনাভাবসম্বন্ধে আবদ্ধ। অর্থাৎ শিব বিনা শক্তি নেই, শক্তি বিনা শিব নেই। তাই তো নারদপঞ্চরাত্রে বলা হয়েছে—

"যত্র লিঙ্গোস্তত্র যোনির্যত্র যোনিস্ততঃ শিবওঃ।"[১০]

যেখানেই লিঙ্গ সেখানেই যোনি, যেখানে যোনি সেখানেই শিব। এই অভিন্নতার প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য, শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে শিব বলেছেন—

"দেবীই আমি পুরুষরূপে, স্ত্রীরূপে আমিই দেবী। আমাদের মধ্যে যে ভেদ কল্পিত হয়, তা অজ্ঞানতা হেতু হয়ে থাকে।" (শক্তিসঙ্গমতন্ত্র— ৩য় ভাগ, সুন্দরী খণ্ড, ৩। ৮৫–৮৬)।

তন্ত্রে দেহভাণ্ডেই যেহেতু শিব-শক্তির অবস্থান মনে করা হয় তাই দেহভাণ্ডে শিবশক্তির সম্মিলন ঘটানোই সাধকের মূল লক্ষ্য থাকে। মূলাধারে নিদ্রিত সর্পাকৃতি কুণ্ডলিনীই হল সেই শক্তি আর শিবের অবস্থান সহস্রারে। সাধকের কাজ হল সেই নিদ্রিত কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করে সুষুম্না বরাবর কুণ্ডলিনীকে অগ্রসর করা (শারদাতিলকতন্ত্র, ২৫। ৬৪)। মাতৃকাভেদতন্ত্রে বলা হয়েছে— "নিজেষ্টদেবতারূপা দেহসংস্থা চ কুণ্ডলী।" অর্থাৎ কুণ্ডলিনী হলেন তান্ত্রিক সাধকের ইষ্টদেবতা (মাতৃকাভেদতন্ত্রম, ১৪। ২)। ব্রহ্মস্বরূপা কুণ্ডলিনী হলেন সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মিকা, বিশ্বাতীতা ও জ্ঞানরূপা। শারদাতিলকে বলা হয়েছে কুণ্ডলিনী চৈতন্যরূপিণী সর্বত্রগামিনী বিশ্বরূপিণী শিবস্বরূপা অথবা শিবসন্নিধি প্রাপ্ত হয়ে অবস্থিতা এবং তিনি ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। সর্বপ্রাণীর মূলাধারে তিনি বিদ্যুতাকারে স্ফুরিতা হন। তিনি আছেন কুণ্ডলীভূত সর্পের আকারে (১। ৫১–৫৪)। কুণ্ডলিনী জীবদেহের জীবশক্তি, যা প্রাণাকারে অভিব্যক্ত। তিনিই শিবস্বরূপিণী।

শিব-শক্তির এই অভেদত্বই প্রতিষ্ঠিত হল এই পদটিতে। আর একটি পদেও রামপ্রসাদ একইভাবে বলছেন—

"অজ্ঞানেতে অন্ধ জীব ভেদ ভাবে শিবাশিব,
উভয়ে অভেদ পরমাত্মারূপিণী।"[১১]

আগেই বলেছি আমাদের কল্পনায় শিবা অর্থাৎ কালী এবং শিব উভয়ে স্বামী-স্ত্রী। কালী স্বামীর বুকে পা তুলে লজ্জায় তাই জিভ বের করেন। কিন্তু প্রকৃতঅর্থে তা নয়। তাঁরা এক ও অভেদ। কালী ও শিব তাই একই মুদ্রার দুইপীঠ। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও দেখি একাকী পুরাণপুরুষ আনন্দ লাভের জন্য নিজের দেহকে দু'ভাগে ভাগ করে পতি ও পত্নী এই দুই রূপে স্থিত হলেন এবং তাঁদের মিলনেই মানবসমূহের জন্ম হল (১। ৪। ৩)। এক্ষেত্রেও তাই। তাঁরা পরমাত্মারূপী পরমব্রহ্ম যাঁদের কোনো লিঙ্গভেদ হয় না। কোনো সম্পর্ক বা মূর্তির সীমায় তাঁদের বাঁধাও সম্ভব নয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে ঈশ্বর লিঙ্গনিরপেক্ষ। শুধু সৃষ্টির কারণে তিনি লিঙ্গরূপ ধরেন। সেই চেতনারই অনুবর্তন দেখি এই পদটিতে। এই প্রসঙ্গে রামপ্রসাদের আর একটি পদের কথা উল্লেখ করা যায়—

"মা কি শুধুই শিবের সতী?
যারে কালের কাল করে প্রণতি।"
ষট্চক্রে চক্র করি' কমলে করে বসতি।
সে যে সর্ব্ব দলের দলপতি,
সহস্রদলে করে স্থিতি।।
ন্যাংটাবেশে শত্রু নাশে, মহাকাল-হৃদয়ে স্থিতি।
বল দেখি মন, সে বা কেমন, নাথের বুকে মারে লাথি?"[১২]

শিব-শক্তি তত্ত্বের সেই অভেদত্ব এখানেও প্রতিপাদিত। রামপ্রসাদ আর একবার মনে করিয়ে দিলেন মা পরমাপ্রকৃতি তাই তিনি শিবের স্ত্রী যা আমরা ভেবে থাকি তা নন। তিনি কোনো চেতনাতেই সীমিত নন। তিনি সাধকের শরীরের চক্র বরাবর কুণ্ডলিনীরূপে অগ্রসর হন। তাই তিনি প্রতিটি চক্রে অবস্থিত 'দলের দলপতি'। আর সহস্রারেই মিলিত হন পরমশিবের সঙ্গে। তাই তাঁর তাই 'নাথের বুকে' পা দেওয়া সংক্রান্ত সমস্ত তত্ত্বই আসলে আমাদের চেতনা। মা পরমব্রহ্ম। আর তাই তাঁর পায়ে অবস্থান করেন স্বয়ং মহাকাল। এই 'কালের কাল' বলতে কিন্তু কবি ভোলানাথ শিবকে বোঝাননি। বুঝিয়েছেন পরমপুরুষ মহাকালকে। মা পরমব্রহ্মরূপিণী। তাই মহাকাল শিবও তাঁকে প্রণতি জানান। মনে পড়ে যায় মহাদেব কথিত যেই আদ্যাস্তব সেইখানে মহাদেব নিজে দেবীকে স্তুতি করছেন—

"ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ
ততোজাতং জগৎ সর্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে।।" (মহানির্ব্বাণ তন্ত্র। চতুর্থ উল্লাস)

অর্থাৎ হে জগৎজননী শিবে, প্রকৃতি বা একমাত্র পূর্ণশক্তি, পরমাত্মা তোমার থেকেই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছে। আসলে পরমপুরুষ শিবই পরমাপ্রকৃতিকে একমাত্র অনুধাবন করতে পারেন, সাধারণের কাছে তিনি অগম্য। তাই রামপ্রসাদ বলেন—

"মহাকাল জানে কালীর মর্ম্ম
অন্য কে বা জানে তেমন?"[১৩]

অন্য একটি পদে রামপ্রসাদ লিখেছেন—

"বাজবে গো মহেশে হৃদে, আর নাচিস্ নে ক্ষেপা মাগী।
মরে নাই শিব বেঁচে আছে, যোগে আছে মহাযোগী।।"[১৪]

এই পদটিতে দেবীর চরণস্থিত শিবকে কবি দেবীর আরাধনায় মগ্ন যোগী হিসেবেই উল্লেখ করেছেন। মহাদেবীর যোগেই তিনি নিমগ্ন রয়েছেন। আসলে সবকিছুই তো পরমাপ্রকৃতির থেকে সৃষ্ট। তাই শিব নিজেই তাঁর যোগে মগ্ন হয়ে নয়ন মুদেছেন দেবীর চরণ লাভের আশায়। কারণ দেবীর স্পর্শে তাঁর শক্তিতেই শব থেকে শিব হয়। কবি তাই বলেন—

"কপট মরণ করছে সাধন, ও চরণ তোর পাবার লাগি।।"[১৫]

কবি আরও বলেছেন—

"বিষখেকো শিব নয় গো সজোর, তোর লাগি ওর মন বিরাগী।"[১৬]

তন্ত্রমতে সমুদ্রমন্থনজাত বিষপান করে শিব যন্ত্রণায় অর্ধমৃত হয়ে পড়েছিলেন। আর্তনাদ করে কেঁদেছিলেন। তখন মহামায়ার স্তন্যপান করে শিব সুস্থ হন। কবি সেই কাহিনিকেই একবার স্মরণ করিয়ে দিলেন আমাদের। মহামায়া কালী এই জগতের প্রতিটি প্রাণীর ধারকশক্তি। শিবও তার বাইরে নন। তাই 'সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা' সেই মহামায়ার অমৃতস্তনেই তাঁর জীবনরক্ষা হয়। কবি তাই বলেছেন বিষ খেয়ে শিব খুব একটা সবল নেই, মহামায়ার জন্যই তাঁর মন অস্থির কারণ তিনিই তাঁকে রক্ষা করতে পারেন। প্রসঙ্গত বলে রাখি অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি কবিয়ালের একটি পদেও এই এক প্রসঙ্গের অবতারণা রয়েছে শিব সম্বন্ধে —

"যে শক্তি হতে উৎপত্তি
সেই শক্তি তোমার পত্নী কি কারণ?
কহ দেখি ভোলানাথ এর বিশেষ বিবরণ।
সমুদ্র মন্থনকালে বিষ পান করেছিলে
তখন ডেকেছিলে দুর্গা দুর্গা বলে
রক্ষা কর আপনি, সেই দিন
কি ভুলে তাহারে বলেছিলে জননী।"[১৭]

সেই শিব-কালী তত্ত্বের প্রেক্ষিতে শিব ও কালীকেন্দ্রিক লোকমননে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ভ্রান্তির প্রসঙ্গই উল্লেখ করেছেন কবি এখানে। রামপ্রসাদের একটি পদে তিনি শিব-গৌরীর সংসারের রূপকার্থের আড়ালে এক গভীর সাধনতত্ত্বের পন্থা উল্লেখ করেছেন —

"ক্ষ্যাপার হাট-বাজার, মা তোদের ক্ষ্যাপার হাট-বাজার।
গুণের কথা কব কার মা, গুণের কথা কব কার।
তোরা দুই সতীনে কেউ কাঁধে কেউ মাথায় চড়িস তাঁর।।
কর্তা যিনি ক্ষ্যাপা তিনি ক্ষ্যাপার মূলাধার।
আবার চাকলা-ছাড়া চেলা দু'টো সঙ্গে অনিবার।।"[১৮]

গানটিতে আপাতঅর্থে গঙ্গা-গৌরী দুই স্ত্রী ও দুই সন্তান কার্তিক-গণেশকে নিয়ে শিবের সংসারের কথাই বলা হয়েছে। যে সংসারে রয়েছে শিবের মত আপনভোলা পাগল এক কর্তা। কিন্তু গুহ্যার্থে এই গানে ব্যক্ত রয়েছে হর-গৌরীর সংসারের রূপকে তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতি। ক্ষ্যাপা শিব ও গৌরীর সংসার। এই 'সংসার' হল সাধকের দেহ। দুই সতীন হল গঙ্গা ও কালী। শিবের মাথায় গঙ্গা যোগীর বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রতীক আগেই বলেছি। তাই গঙ্গা চড়েন মাথায় অর্থাৎ সুষুম্না বরাবর কুণ্ডলিনী গমন করেন সহস্রারে। আর বুকে চড়েন পরমাপ্রকৃতি কালী স্বয়ং যাঁকে আমরা দেখি শিবের বুকের উপর পা রেখে কারণ তাঁর পাদস্পর্শেই তো শিব 'শব' হন। আর কর্তা বলতে কবি বুঝিয়েছেন এখানে পরমাপ্রকৃতি দেবীকেই, শিবকে নয়। কারণ তন্ত্রসাধনায় দেবীই মূল। তিনিই 'ক্ষ্যাপার মূলাধার' অর্থাৎ মূলাধার চক্রে তাঁর অবস্থান কুণ্ডলিনীরূপে। 'চাকলা ছাড়া চেলা দু'টো' বাহ্য অর্থে কার্তিক ও গণেশ হলেও তারা আসলে ইড়া ও পিঙ্গলারূপে এখানে উপস্থাপিত। তারা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 63 - 74
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'অনিবার' সঙ্গে চলে কারণ সুষুম্না বরাবর কুণ্ডলিনী যখন অগ্রসর হয় দু'পাশ দিয়ে ইড়া ও পিঙ্গলাও চলে শেষ পর্যন্ত। কবির কল্পনায় তারা শিব-শিবানীর দুই সন্তান হয়ে উঠেছে। এইভাবে এই পদটির মধ্যে দিয়ে কবি শিব-শক্তি তত্ত্বের স্বরূপ উন্মোচন করলেন একটি সাংসারিক আবহের মধ্যে দিয়ে।

শিব-কালী সম্পর্কের আর একটি মধুর ও অনবদ্যরূপ পাই 'আমায় দেও মা তবিলদারী' পদে। সেখানে কবি বলছেন—

> "ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
> শিব আশুতোষ স্বভাব-দাতা, তবু জিম্মা রাখ তাঁরি।।"[১৯]

বাহ্য অর্থে দেখে মনে হয় স্ত্রীর রক্ষাকর্তা হিসেবে কবি শিবকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তন্ত্রসাধনার ক্ষেত্রে ভৈরব হলেন দ্বারপাল। তাই দেবীকে পেতে হলে তাঁকেই প্রথম তুষ্ট করতে হয়। ভৈরব সাধকের সিদ্ধির পথকে সুগম করে। এখানে 'ভোলা ত্রিপুরারি' হলেন তান্ত্রিক ভৈরব। তাঁকে তুষ্ট করেই দেবীর কাছে পৌঁছানো সম্ভব। তিনিই দেবীর কাছে পৌঁছানোর পথের চাবি নিয়ে বসে রয়েছেন। এদিকে স্বভাবগতভাবে শিব আশুতোষ, ভোলা মহেশ্বর, সামান্য বেলপাতাতেই তুষ্ট হয়ে ভক্তকে বরপ্রদান করেন। তাই কবির মনে হয়েছে এমন ভোলা যিনি তিনি সহজেই যে কাউকে দেবীর পদরত্নভাণ্ডারে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে দেবেন। এরপরেই কবি বলেছেন—

> "অর্দ্ধ-অঙ্গ জায়গির— মাগো, তবু শিবের মাইনে ভারি।"[২০]

অর্থাৎ মহাদেবী কালী হলেন এই সাধনপথের জমিদার। তাও তিনি তাঁর 'অর্দ্ধ-অঙ্গ জায়গির' দিয়ে রেখেছেন শিবকে। আপাত ভাবে দেখলেন সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে কালী শিবের অর্ধাঙ্গিনী বলে মনে হলেও আসলে অর্ধনারীশ্বর তত্ত্বকে কবি মনে করালেন এখানে যেখানে একই অঙ্গে শিব ও শক্তি এক হন, যেখানে তাঁরা অবিচ্ছেদ্য ও অভেদ। আর সেই স্থান হল সাধকের সহস্রার।

রামপ্রসাদ মাতৃভাবের সাধক। তাই মায়ের উপর তাঁর ভালোবাসা-অভিমান সবকিছুই রয়েছে। একটি পদে তিনি শিব-কালীর সম্পর্ক নিয়ে মায়ের উপরেই অভিমান পোষণ করেছেন। এতক্ষণের আলোচিত পদগুলির মত এখানে শিব-শক্তি তত্ত্বের কোনো গূঢ় দিক নেই। শুধু রয়েছে বাৎসল্যভাবে এক সন্তানের মায়ের অধিকারপ্রাপ্তি নিয়ে মধুর অভিযোগ। এখানে কবি বলেছেন—

> "আমি কি আটাশে ছেলে?
> ভয়ে ভুলব না কো চোখ রাঙ্গালে।।
> সম্পদ আমার ও রাঙ্গা-পদ, শিব ধরে যা' হৃদ্-কমলে।
> ও মা, আমার বিষয় চাইতে গেলে বিড়ম্বনা কতই ছলে।।
> শিবের দলিল সই মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে।
> এবার করবো নালিশ নাথের আগে, ডিক্রী লব এক সওয়ালে।।
> জানাইব কেমন ছেলে, মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে।
> যখন গুরু-দত্ত দস্তাবেজ, গুজরাইব মিছিল-কালে।।
> মায়ে-পোয়ে মোকদ্দমা, ধূম হবে রামপ্রসাদ বলে।
> আমি ক্ষান্ত হব, যখন আমায় শান্ত ক'রে লবে কোলে।।"[২১]

এখানে 'আটাশে ছেলে' বলতে কবি বুঝিয়েছেন আটমাসে জন্ম যেই শিশুর অর্থাৎ অপরিণত শিশু যারা সাধারণত ভীরু স্বভাবের হয়। কবি চেয়েছেন মায়ের রাঙাপদের অধিকার। তিনি 'আটাশে ছেলে' নন। তাই চোখ রাঙিয়ে, ভয় দেখিয়ে তাঁকে থামানো যাবে না। যা কবি চান তা শিব বুকে ধারণ করে রয়েছেন। এখানে শিব কবির কাছে প্রতিদ্বন্দ্বী। শিব ও শক্তির সম্পর্কের যে চিরন্তনতা ও অবিচ্ছেদ্যতা তা কবি সমস্ত অন্তঃকরণে বিশ্বাস করেন তাই সেই সম্পর্ককে তিনি তাঁর হৃদয় দিয়ে সিলমোহর দিয়েই রেখেছেন। কিন্তু তার জন্য মায়ের রাঙাপদের অধিকার তিনি শিবকে ছেড়ে দিতে রাজি নন। কিন্তু এই সম্পদের জন্য কবি কোন আদালতেই বা যাবেন? তাই স্থির করেছেন দেবীর নাথ অর্থাৎ শিবের কোর্টেই তিনি

মামলা করবেন। 'মায়ে-পোয়ে' হবে আইনি মোকদ্দমা যার বিচারক হবেন শিব নিজে। গুরুর দেখানো পথে তিনি এই মোকদ্দমা লড়বেন। কিন্তু মা যদি তাঁকে কোলে নেয় তবে তিনিও শান্ত হয়ে যাবেন। পদটিতে সাধক রামপ্রসাদের মায়ের প্রতি আর্তি অপূর্ব রূপ নিয়েছে আর মহাদেব সেখানে একদিকে কবির প্রতিযোগী আবার অন্যদিকে কবির লড়াই করে মাকে প্রাপ্তির পথে বিচারক। যেই লড়াইতে 'গুরু-দত্ত দস্তাবেজ' নিয়ে কবি জিতবেনই কারণ যিনি বিচারক সেই ভোলানাথের কাছেই তো আছে মায়ের 'ভাঁড়ার জিম্মা'। তিনিই কবিকে পৌঁছে দিতে পারেন মহামায়ার প্রার্থিত চরণে। রামপ্রসাদের পদে শিব-শিবানী মূলত এসেছেন সাধক কবির আত্তীকৃত তন্ত্রতত্ত্বের পরিবেশনের মাধ্যমে। যেখানে শিব ও শক্তি একাকার হয়ে গিয়েছেন।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের পদাবলী : 'শিব-উমা'র সংসার ও মাতৃহৃদয়ের যন্ত্রণার অনুরণন :

রামপ্রসাদের সবটুকু যেমন ঘনীভূত হয়ে রয়েছে 'ভক্তের আকুতি' পর্যায়ে তেমনি অষ্টাদশ শতকের বাংলার আর এক কবি কমলাকান্ত চক্রবর্তীর প্রতিভার সবটুকুকে ঘিরে রয়েছে 'আগমনী' ও 'বিজয়া' পর্যায়ের পদগুলি। শাক্ত পদাবলীর ক্ষেত্রে আমরা দু'ধরণের বৈচিত্র্য দেখতে পাই। শ্যামা বিষয়ক ও উমা বিষয়ক। কমলাকান্তের আগমনী ও বিজয়ার পদগুলিতে উমা উঠে এসেছেন বাঙালি মায়ের কন্যা সম্পর্কিত বিরহবিধুরতার দুঃখ-যন্ত্রণাকে মন্থন করে। হিমালয়, মেনকা, উমা, শিব কেউই আমাদের সামনে পৌরাণিক দেবদেবীরূপে এলেন না। এলেন একটা নিষ্ঠুর সামাজিক প্রথার অংশ হয়ে। যেখানে 'আধ আধ' বচনে কথা বলা অর্ধস্ফুট বালিকা উমাদের কৌলীন্য প্রথার তাগিদে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা-মাতাকে বুকে পাথর চাপা দিয়ে তুলে দিতে হত শিবের মত বৃদ্ধ, বোহেমিয়ান, সহায়-সম্বলহীন পুরুষদের হাতে। সামাজিক প্রথার ভয়াবহ বলিকাঠে বলিপ্রদত্ত এই উমাদের জন্য তাই মেনকার মত মায়েদের অবরুদ্ধ কান্না ছাড়া আর কিছুই করার থাকত না। সেই মাতৃহৃদয়ের যন্ত্রণা থেকেই সৃষ্টি হল আগমনী ও বিজয়ার পদগুলি যেখানে বাংলার উমারা একীভূত হলেন শিবানী উমার সঙ্গে। শাক্তপদাবলীর 'আগমনী' শিবের মত পাগল ও ভিখারির সঙ্গে মেয়ের সাংসারিক কষ্টের কথা চিন্তা করে কন্যাবিরহাতুরা জননী মেনকার প্রতীক্ষা ও অশ্রুবেদনার কাহিনি। আর 'বিজয়া' হল উমার পতিগৃহে যাত্রার কথা চিন্তা করে মায়ের হৃদয়ছেঁড়া যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। উমা ও শিব দু'জনেই দেবত্বের সীমা অতিক্রম করে বাঙালির পারিবারিক জীবন-যন্ত্রণার সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছেন কমলাকান্তের হাত ধরে। রবীন্দ্রনাথের কথায়—

> "আমাদের বাংলাদেশের এক কঠিন অন্তর্বেদনা আছে— মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো। অপ্রাপ্তবয়স্ক অনভিজ্ঞ মূঢ় কন্যাকে পরের ঘরে যাইতে হয়, সেইজন্য বাঙালি কন্যার মুখে বঙ্গদেশের একটি ব্যাকুল করুণ দৃষ্টি নিপতিত রহিয়াছে। সেই সকরুণ কাতরস্নেহ, বাংলার শারদোৎসবে স্বর্গীয়তা লাভ করিয়াছে। আমাদের এই ঘরের স্নেহ, ঘরের দুঃখ, বাঙালি গৃহের এই চিরন্তন বেদনা হইতে অশ্রুজল আকর্ষণ করিয়া লইয়া বাঙালি হৃদয়ের মাঝখানে শারদোৎসবে পল্লবে ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা বাঙালির অম্বিকা পূজা এবং বাঙালির কন্যাপূজাও বটে। আগমনী ও বিজয়া বাংলার মাতৃহৃদয়ের গান।"[২২]

কমলাকান্তের আগমনী গানে দেখি উমাকে বিয়ে দেওয়ার পর থেকেই মেনকা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। উমা রাজদুলালী, বালিকা। অন্যদিকে শিব দরিদ্র, বৃদ্ধ, বিবাগী গোছের মানুষ। তাই একমাত্র সম্বল উমাকে শিবের হাতে তুলে দিয়ে মেনকাকে গ্রাস করেছে এক প্রবল নিঃসঙ্গতা। সচেতনে বা অবচেতনে উমার সেই সাংসারিক যন্ত্রণাই তাঁকে দীর্ণ করেছে প্রতি মুহূর্তে। তাই তিনি স্বপ্নেও উমাকেই দেখেন। হঠাৎ স্বপ্নে উমাকে দর্শন করে মার মন উৎকণ্ঠায় আকুল হয়ে ওঠে। কেন এসেছিল উমা এই চিন্তায় মায়ের হৃদয় হাহাকারে উথালপাতাল করতে থাকে। এমন মনোকষ্টের মুহূর্তে মেনকার মাতৃহৃদয়ের সব রাগ গিয়ে পড়ে দরিদ্র, নিরীহ, আপনভোলা জামাইয়ের উপর। রাজনন্দিনী উমা শ্মশানচারী শিবের সঙ্গে ভালো নেই। সেই সংসারে বড়ই একাকিনী সে। এমন মনোকষ্টের মুহূর্তে গিরিরাজকে ঘুমোতে দেখে মায়ের অভিযোগ আরো বাড়তে থাকে। তাই অসহায় বালিকা উমার কষ্টের কথা ভেবে গিরিরাজকে ডেকে মেনকা বলেন—

"আর শুন অসম্ভব- চারিদিকে শিবা-রব হে!

তার মাঝে আমার উমা একাকিনী শ্মশানে।
বল কি করিব আর, কে আনিবে সমাচার হে?
না জানি মোর গৌরী আছে কেমনে!"[২৩]

আসলে জামাতা শিব বৃদ্ধ, পাগল, ভিখারি। বাঘছাল পরে গায়ে ভস্ম মেখে শ্মশানে ঘুরে বেড়ায়। এই রকম চালচুলোহীন বরের সঙ্গে উমার বিয়ে দেওয়ায় মেনকার মাতৃহৃদয়ের সব অভিযোগ এসে জমা হয়েছে হিমালয়ের উপর। তাছাড়া উমা বালিকা যার মুখের কথা এখনও 'আধ আধ' বলে কমলাকান্ত উল্লেখ করেছেন। এর মাধ্যমে উমার অর্ধস্ফুট মানবীসত্তাকে চিহ্নিত করে বাংলার কৌলীন্যপ্রথার ভয়ংকর রূপটিকেও দেখালেন কবি। কুলের মর্যাদা বাঁচাতে যেখানে হিমালয়ের মতো পিতারা তাদের মেয়েদের এইভাবে বিয়ের নামে বিসর্জন দিতেন। যেই উমার কথা স্পষ্ট হয়নি সেই অপরিণত উমাদের এইরকম অযোগ্য স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে সমাজের নির্মম যূপকাষ্ঠে বলি দিতেন বাবা-মায়েরা। তাই মেনকা হিমালয়কে বলেন—

"গিরিরাজ ভিখারী সে শূলপাণি, তাঁরে দিয়ে নন্দিনী,
আর না কখন মনে কর একবার।
কেমন কঠিন বল হৃদয় তোমার।।"[২৪]

মায়ের এই স্বপ্ন আরও বেশি দুঃস্বপ্ন হয়ে ঘনীভূত হয়েছে নারদ কর্তৃক প্রদত্ত কৈলাসের সংবাদে। নারদ এসে জানিয়েছেন কৈলাসে উমার ভীষণ কষ্ট। জামাতা শিব ভীষণ দরিদ্র, পরনের বসনটুকুও তাঁর জোটে না। পরিধেয় তার বাঘছাল। অতিবৃদ্ধ বলে মাথায় রয়েছে এক বিশাল জটা। কোনো চালচুলোও তার নেই। শ্মশানে ঘুরে বেড়ায় তার প্রাণের ধন উমাকে নিয়েই। গায়ে মাখে ছাই-ভস্ম। ভূষণ তার সাপ। এমনই পাগল বিষ খায়। জননীর কাছে এগুলি শিবের রিক্ততার ও দারিদ্র্যের চিহ্ন। এমন পাগল, দরিদ্র শিবের সঙ্গে ঘর করতে হয় বলে মেনকার বড় দুঃখ। তাঁর কাছে শিব গুণহীন, পাগল, দরিদ্র এক পুরুষ। তাই গিরিরাজকে মেনকা বলেন—

"জান তো জামাতার রীত, সদাই পাগলের মত,
পরিধান বাঘাম্বর, শিরে জটাভার।
আপনি শ্মশানে ফিরে, সঙ্গে লোয়ে যায় তাঁরে
কত আছে কপালে উমার।।
শুনেছি নারদের ঠাঁই, গায়ে মাখে চিতা-ছাই;
ভূষণ ভীষণ তার, গলে ফণি-হার।
এ কথা কহি কায়, সুধা ত্যজি বিষ খায়,
কহ দেখি এ কোন্ বিচার।।"[২৫]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কমলাকান্তের পদে উমা ও শিবের সংসারের মোড়কেও সাধকের চেতনার শিব ও শক্তিতত্ত্ব মাঝেমধ্যেই উঁকি দিয়েছে। 'সুধা ত্যজি বিষ খায়' শব্দবন্ধটির মধ্যে দিয়ে কবি সকল বিষনাশকারী, তমোনাশকারী নীলকণ্ঠ মহাদেবকেই গ্লোরিফাই করে তুললেন ব্যজস্তুতির আড়ালে।

মেনকার এই অভিযোগের পরে হিমালয় চেষ্টা করেছেন তাঁর স্ত্রীকে প্রবোধ দিতে। এরমধ্যে একদিকে মধ্যযুগের কন্যাদায়গ্রস্ত বাবার স্তোকবাক্যে স্ত্রীকে ভোলানোর চেষ্টা যেমন রয়েছে তেমনি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে শিব ও উমার চিরন্তন প্রেম ও দাম্পত্যের সম্পর্কের জায়গাটিও। হিমালয় বলেছেন—

"বরঞ্চ ত্যজিয়া মণি ক্ষণেক বাঁচয়ে ফণী।
ততোধিক শূলপাণি ভাবে উমা মারে।।
তিলে না দেখিলে মরে সদা রাখে হৃদিপরে
সে কেন পাঠাবে তারে সরল অন্তরে।"[২৬]

পদটির মধ্যে দিয়ে শিব ও উমার এক সরল দাম্পত্যের ছবি স্পষ্ট। কুমারসম্ভবে উমা ছদ্মবেশী শিবকে বলেছিলেন—

"মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতং।"[২৭]

রবীন্দ্রনাথ ‘কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা’ প্রবন্ধে লিখেছেন—

> “এ যে রস এ ভাবের রস, সুতরাং ইহাতে আর কথা চলিতে পারেনা। মন এখানে বাহিরের উপর জয়ী।”[২৮]

শিব-পার্বতীর চিরন্তন দাম্পত্য সম্পর্কে ভারতীয় জীবনে এই কথাটিই সত্যি। বাহ্যনিয়মে তাঁরা পরস্পর সংগতপূর্ণ নাও হতে পারেন কিন্তু তাঁরা অবিচ্ছেদ্য। শিব-উমার প্রেমের মাধ্যমে র শিব-শক্তি তত্ত্বের সেই অবিচ্ছেদ্যতাকেই স্পষ্ট করলেন কবি। তাই হিমালয় বলেছেন—

> “উমার অঙ্গের ছায়া শীতলে শঙ্কর-কায়া;
> সে অবধি শিব-জায়া বিচ্ছেদ না করে।”[২৯]

স্ত্রীর যন্ত্রণা দূর করতে গিরিরাজ আনতে যান উমাকে। কিন্তু কমলাকান্তের উমা তো মধ্যযুগের বাংলার সাধারণ পল্লীবালিকা। তাই স্বামীর অনুমতির জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হয়। বাবাকে দেখে বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্য আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠেন উমা। তাই পিতৃভবনে যাওয়ার অনুমতি নিয়ে স্বামীর কাছে উপস্থিত হয় সে। মৃদু স্বরে প্রার্থনা জানিয়ে বলে—

> “গঙ্গাধর, হে শিবশঙ্কর, কর অনুমতি হর
> যাইতে জনক-ভবনে।”[৩০]

শিব যাতে অনুমতি দেন তাই আগেই প্রতিশ্রুতি দিতে হয়— “আসিব ত্রিদিনে।”[৩১] অনুমতি পেয়ে গিরিরাজের সঙ্গে উমা আসেন বাপের বাড়ি। উমা এলে আনন্দে অধীর হয়ে ওঠেন মেনকা। মেয়েকে কোলে নিয়ে স্নেহের চুম্বনে ভরে দেন। উমাকে জিজ্ঞেস করেন তার সংসারের কথা। তিনি শুনেছেন সতীন গঙ্গাকে নিয়ে উমাকে ঘর করতে হয়। সেই সতীনকেই আবার মহাদেব মাথায় করে রাখেন। গঙ্গাকে জটায় ধারণ করে পৃথিবীকে মহাপ্লাবনের হাত থেকে রক্ষা করেন পৌরাণিক মহাদেব। শিবের জটায় গঙ্গা বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রতীক। অথচ কমলাকান্তের দৃষ্টিতে শিবের জটায় গঙ্গা রূপান্তরিত হলেন উমার সতীনে। আসলে মধ্যযুগের সমাজে সতীন প্রথা নারীর জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। সতীন যন্ত্রণা নারীর অস্তিত্বকে কতখানি নাড়িয়ে দিয়েছিল তা চণ্ডীমঙ্গলের বণিকখণ্ডের লহনা-খুল্লনার সম্পর্ক থেকেই বোঝা যায়। কমলাকান্ত উমাকে কেন্দ্র করে সেই প্রথাকেই চিহ্নিত করলেন। ঘরে সতীন আছে বলে মেনকার চিন্তার অন্ত নেই। হয়তো ভিখারি শিবের সংসারে উমা সতীনের দ্বারা নিগৃহীত হয় উমা— এই ভেবেই ব্যাকুল হয়েছে মায়ের মন। বুদ্ধিমতী উমা কিন্তু স্বামীর সব নেতিবাচক দিক আড়াল করে মাকে প্রবোধ দেয় এই বলে—

> “কে বলে দরিদ্র হর রতনে রচিত ঘর মা
> জিনি কত সুধাকর শত দিনমণি।
> শুনেছ সতীনের ভয় সে সকল কিছু নয় মা
> তোমার অধিক ভালোবাসে সুরধুনী।”[৩২]

এই কথার সত্যতা কতটা আমরা জানি না। কিন্তু তিনদিনের জন্য বাপের বাড়ি এসে বাংলার উমারা বোধ হয় এভাবেই তাদের জননীদের প্রবোধ দিত। শিব যতই অকর্মণ্য, অলস, বৃদ্ধ, রিক্ত হোন না কেন স্বামীর ঘরের সমস্ত অভাব তারা অব্যক্তই রাখত মায়ের কাছ থেকে। উমার সঙ্গে নিবিড় আদরে মেনকার তিনটি দিন অতিবাহিত হয়। নবমী নিশিও অতিক্রান্ত হয়। দশমীতে শিব এসে দাঁড়ায় হিমালয়ের দরজায় তাঁর প্রাণপ্রিয় উমাকে নিয়ে যেতে। শিবের ডমরুর শব্দ শুনে মায়ের অন্তর যেন বিদীর্ণ হয়। বিজয়ার পদে তাই মূর্ত হয় মাতৃহৃদয়ের গভীর যন্ত্রণা। মেনকা এখানে অসহায় দুঃখিনী মা। জামাতা শিব দরিদ্র, আপনভোলা, পাগল গোছের মানুষ। ঘরে তার রয়েছে আর এক স্ত্রী গঙ্গা। সেই সংসারে মেয়েকে কার ভরসায় বিদায় দেবেন মেনকা? যেই জামাইয়ের গলায় সর্বক্ষণ সাপেরা ঝুলে থাকে, যার বাস শ্মশানে এইরকম লোকের হাতে কীভাবে সোনার পুতুল উমাকে তিনি তুলে দেবেন? কন্যার ভবিষ্যতের কথা ভেবে শুধুই অন্ধকার দেখতে পান। আর তাই নিরীহ শিব তাঁর চোখে হয়ে ওঠে অপরাধী। শিবের প্রতি চূড়ান্ত বিরূপতা থেকে তিনি জয়াকে ডেকে বলেন—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 63 - 74
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"জয়া বল গো পাঠানো হবে না।"[৩৩]

কমলাকান্তের মেনকার কাছে আসলে শিব চূড়ান্ত অযোগ্য, দরিদ্র, ভিখারি জামাই যে তাঁর মেয়ের জীবনের সমস্ত সর্বনাশের কারণ। তাই বিজয়ার পদে মেনকা বলেন—

"আর কত দুঃখ পাবে সেখানে, জয়া হর যে জনম ভিখারী।।
ওগো, শ্মশানে মশানে লৈয়ে যায় সে ধনে,
আপনার গুণ কিছু জানে না।
আবার কোন্ লাজে হর এসেছেন লইতে;
জানে না যে বিদায় দেবে না।।"[৩৪]

এই ভাবে কমলাকান্তের পদে সমস্ত দেবত্বকে দূরে সরিয়ে রেখে শিব হয়ে উঠেছেন মধ্যযুগীয় বাংলার অকর্মণ্য, রিক্ত, ভিখারি এক বোহেমিয়ান গোছের মানুষ আর উমা সেই অযোগ্য শিবের কাছে বলিপ্রদত্ত এক সরলা গ্রাম্য বালিকা। কিন্তু সাধক কবি এই শিব-উমাকেন্দ্রিক এই পারিবারিক আলেখ্যর মধ্যেও শিব-শক্তির পরম-পুরুষ ও পরমাপ্রকৃতির তত্ত্বকে ভুলে যাননি। তন্ত্রমতে পরমাপ্রকৃতিকে লাভ করতে হলে আগে ভৈরবকেই তুষ্ট করতে হয় কারণ ভৈরব দেবীর কাছে পৌঁছানোর মার্গ প্রদর্শন করেন। তাঁরা অবিচ্ছেদ্য ও অভেদ তাই বিজয়ার পদে মেনকা শিবকে এত বিরূপতা প্রদর্শন করলেও শেষ অবধি কবি মনে করিয়ে দিয়েছেন—

"শিব বিনা শিবা পাবে না।
যদি জামাতা শঙ্করে পার রাখিবারে
তবে তোমার গৌরী যাবে না।"[৩৫]

প্রাথমিকভাবে সমকালীন জীবনের প্রেক্ষিতে হর-গৌরীকে স্থাপন করলেও কবি কিন্তু তাঁদের স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন। তাই সাধক কবি শেষ অবধি তন্ত্রের সেই শিব-শক্তি তত্ত্বের অবিচ্ছেদ্যতাই মনে করিয়ে দিলেন পাঠককে। হর-গৌরী যে এক ও অবিচ্ছেদ্য শেষ অবধি এই চেতনাকেই উজ্জ্বল করে তুলতে চেয়েছেন কবি পদে।

এইভাবে এই দুই কবির শাক্ত পদগুলিতে যেমন আমরা রূপকার্থের আড়ালে শিব-শক্তি তত্ত্বের নিগূঢ় পরিচয় পাই তেমনি উমা ও শিব দু'জনেই দেবত্বের সীমা অতিক্রম করে বাঙালির পারিবারিক জীবন-যন্ত্রণার সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছেন। শিব হয়েছেন প্রতিটি বলিপ্রদত্ত বাঙালি উমার অলস, অকর্মণ্য, পাগল স্বামীর প্রতিরূপ। আর তাই তাঁকে কেন্দ্র করে উমার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন মেনকার কান্না অনুরণিত হয়েছে বঙ্গদেশের প্রতিটি ঘরের মাতৃহৃদয়কে মন্থন করে।

Reference:

১. রায়, অমরেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত), 'শাক্ত পদাবলী' (চয়ন), নবম সংস্করণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০, পৃ. ১২৪
২. সেন, কল্পনা, 'রামপ্রসাদ সেন ও সমকালীন ভারতবর্ষ', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, সুচেতনা, রথযাত্রা, আষাঢ়, ১৪১৮, পৃ. ১২২
৩. তদেব, পৃ. ১২৩
৪. ভট্টাচার্য, শিবপ্রসাদ, 'ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ', কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সি, পৃ. ৩৯৮
৫. প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী, 'তন্ত্রে তত্ত্ব ও সাধনা', চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, এপ্রিল, ২০১০, পৃ. ৭৫
৬. রায়, অমরেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত), 'শাক্ত পদাবলী' (চয়ন), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩
৭. জগদীশ্বরানন্দ স্বামী অনূদিত, 'শ্রীশ্রীচণ্ডী', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, রথযাত্রা, ১৮ আষাঢ়, ১৪১৮, পৃ. ২৭১
৮. ভট্টাচার্য, শিবপ্রসাদ, 'ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৮
৯. রায়, অমরেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত), 'শাক্ত পদাবলী' (চয়ন), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 63 - 74
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১০. বিদ্যালঙ্কার, রামতোষণ (সংকলিত), ‘প্রাণতোষিণী তন্ত্র’, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯২৮, পৃ. ৩৩১
১১. লাহিড়ি, দুর্গাদাস (সম্পাদিত), ‘বাঙালীর গান’, কলকাতা, বঙ্গবাসী কার্যালয়, ১৩১২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩২
১২. রায়, অমরেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত), ‘শাক্ত পদাবলী’ (চয়ন), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫
১৩. তদেব, পৃ. ১৯৮
১৪. তদেব, পৃ. ১৪৯
১৫. তদেব
১৬. তদেব
১৭. লাহিড়ি, দুর্গাদাস (সম্পাদিত) ‘বাঙালীর গান’, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫
১৮. গৌরীশ্বরানন্দ স্বামী ও স্বামী বেদানন্দ (সংকলিত), ‘সঙ্গীতসংগ্রহ’, বৈদ্যনাথ-দেওঘর, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পৃ. ১৩৯
১৯. রায়, অমরেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত), ‘শাক্ত পদাবলী’ (চয়ন), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪
২০. তদেব
২১. তদেব, পৃ. ২০৮
২২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘লোকসাহিত্য’, বিশ্বভারতী, ফাল্গুন ১৩৯৯, পৃ. ৩৫
২৩. রায়, অমরেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত), ‘শাক্ত পদাবলী’ (চয়ন), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
২৪. তদেব, পৃ. ১০
২৫. তদেব, পৃ. ১৫
২৬. তদেব, পৃ. ২১
২৭. চক্রবর্তী, ধ্যানেশনারায়ণ (সম্পাদিত), ‘মহাকবি কালিদাসের সমগ্র রচনাবলী’ (প্রথম খণ্ড), তথাগত ফ্যাক্সিমিলি সংস্করণ, কলকাতা, তথাগত, ভাদ্র, ১৪২৭, পৃ. ২১৮
২৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘রবীন্দ্র রচনাবলী’ (তৃতীয় খণ্ড), বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪১৫, পৃ. ৭২০
২৯. রায়, অমরেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত), ‘শাক্ত পদাবলী’ (চয়ন), প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
৩০. তদেব, পৃ. ২৪
৩১. তদেব, পৃ. ২৫
৩২. তদেব, পৃ. ৫০
৩৩. তদেব, পৃ. ৬৯
৩৪. তদেব, পৃ. ৬৯-৭০
৩৫. তদেব, পৃ. ৭০